Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারুফা জাহান

রোলঃ 23100121060

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারুফা জাহান

রোলঃ 23100121060

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারুফা জাহান, আইডিঃ 23100121060 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

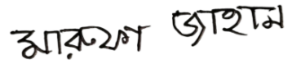

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মারুফা জাহান

আইডিঃ 23100121060

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবতের সংজ্ঞা 6

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ 8

গীবত একটি কবিরা গুনাহ 9

গীবতের প্রকারভেদ 10

গীবত করা ব্যভিচার থেকে জঘন্য পাপ 17

গীবত এমন একটি গুনাহ যা সুদ থেকেও নিকৃষ্ট 18

গীবতের পরিণতি বুঝাতে একটি শিক্ষণীয় স্বপ্ন 19

হারাম খাবারের অন্ধকার দিক 20

অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গীবত করা 22

ফাসেক-পাপাচারীর গীবত করা জায়েয নয় 24

জালিমের জুলুমের কথা আলোচনা করা গীবত নয় 25

অন্যদের আলোচনা না করাই উত্তম 26

গীবত থেকে পরিত্রাণের একটি বাস্তবাশ্রিত নির্দেশনা 27

গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতি 29

নিজের রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 30

অনর্থক কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক পরিহার করুন 34

গীবতের কাফফারা 35

গীবত থেকে আত্মরক্ষার সহজ উপায় 39

গীবতের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, শুনলে অসন্তুষ্ট হবে 41

এমন হাসি-ঠাট্টা জায়েয নয় 42

গীবতকে জায়েয করার জন্য নফসের বাহানা 43

বুজুর্গদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 45

স্নেহপরবশ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ 47

গীবতের প্রকৃত ওষুধ বিনয়......48
গীবত থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়......49

গীবতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন কোন দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে গীবত বলা হবে ।

গীবত বলা হয় আড়ালে কারও নিন্দা বর্ণনা করা।সেই নিন্দা বিষয়টি তার মাঝে বাস্তবেই থাকতে পারে আবার ,নাও থাকতে পারে । যদি বাস্তবেই ওই লোকটির মাঝে সেই দোষ ত্রুটি থেকে থাকে আর কেউ তা বয়ান করে তাহলেও সেটি গীবতের আওতায় পড়বে । হোক তা বাচনিক কিংবা লেখনীর মাধ্যমে,অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো পন্থায়ই হতে পারে । আর যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই ,তা হলে তা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গন্য হবে । একেই কুরআনের ভাষায় 'বুহতান' বলা হয় ।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

''তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেন: আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন: তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে বলা। জনৈক সাহাবী বললেন: আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ''। (মুসলিম ২৫৮৯; আবূ দাউদ ৪৮৭৪; তিরমিযী ১৯৩৪)

অর্থাৎ এখন আসুন, আমরা আমাদের আসর, মজলিশের প্রতি একটু দৃষ্টি ফেলে দেখি যে, আমাদের মাঝে গীবত কতটা ব্যাপকতা ধারণ করেছে। দিন-রাত আমরা সেই গুনাহের মাঝেই লিপ্ত রয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন। কিছু লোককে শোনা যায়, তারা বলে-আমি তো তার গীবত করছি না; এ কথা আমি তার মুখের ওপর বলতে পারব। তার এই যুক্তি দেওয়ার কারণ হলো, যখন আমি এ কথা তার মুখের ওপর বলতে সক্ষম; কাজেই আমার জন্যে তার গীবত করা জায়েয। মনে রাখুন, আপনি এ কথা তার মুখের ওপর বলতে পারুন, বা না পারুন, সর্বাবস্থায় এটি গীবত। কাজেই আপনি যখুনি কারও মন্দ কথা বর্ণনা করবেন, তখন সেটি গীবত হয়ে যাবে। যা কবিরা গুনাহ।

গীবত একটি মারাত্মক গুনাহ্

ইমাম নববি রহ. জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন। সেই তালিকার মাঝে তিনি সর্বপ্রথম গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের মধ্যে এটির ব্যাপকতাই সবচেয়ে বেশি। এটি এমন এক ব্যাধি; যা আমাদের প্রতিটি আসরে, প্রতিটি মজলিশে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্ত নয়। কোনো আলাপচারিতা আজ গীবতের জঞ্জাল থেকে পবিত্র নয়। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যেই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে; অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষা ব্যবহার করেনি।

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২]

কাজেই তোমরা যখন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে খুবই অপ্রিয় মনে করো, তাহলে এখন থেকে গীবত করাকেও তেমনি খারাপ মনে করতে শুরু করো। লক্ষ করে দেখুন, এখনে কীভাবে আল্লাহ তায়ালা গীবতের মন্দত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের গোশত খাওয়া তথা আদমখোর হওয়াটা সত্তাগত বিচারে খুবই জঘন্য বিষয়। উপরন্তু সেটি যদি নিজের ভাইয়ের গোশত খাওয়া, তাও আবার মৃত ভাইয়ের, তাহলে সেটি কতটা জঘন্যতার পরিচায়ক। কাজেই নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন একটি চরম ধিকৃত ও বিকৃত অপরাধ; তদ্রুপ গীবতও একটি জঘন্য ও ধিকৃত অপরাধ।

গীবত একটি কবিরা গুনাহ্

মদ পান করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা; এগুলো যেমন কবিরা গুনাহ তদ্রুপ গীবত করাও একটি কবিরা গুনাহ। উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সবক'টিই অকাট্য হারাম; বরং গীবত যেহেতু বান্দার হক সম্পর্কিত কবিরা গুনাহ; কাজেই তার ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা অন্যগুলোর তুলনায় বেশি প্রকট। কেননা বান্দার হক নষ্ট করা এমন এক অপরাধ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বান্দা মাফ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধীর ক্ষমা নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর হক সম্পর্কিত গুনাহগুলো তাওবা ইসতিগফারের মাধ্যমে মাফ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু স্রেফ তাওবা-ইসতিগফার দিয়ে গীবত মাফ হয় না। কাজেই এর দ্বারা বুঝে নিন, গীবত কতটা জঘন্য পাপ। আসুন, আমরা নিবিষ্ট মনে মনোযোগ প্রদান করি যে, আজ থেকে গীবত করবও না, গীবত শুনবও না। যদি আমাদের মজলিশে গীবত শুরু হয়ে যায়, তাহলে আমরা প্রথমত চেষ্টা করব; যেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অন্য কোনো প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করব। যদি কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম না হই, তাহলে সেই মজলিশ থেকে উঠে যাব। কেননা গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রুপ গীবত শ্রবণ করাও হারাম।

গীবতের প্রকারভেদ

প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্কুলদেহী বা বেটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা দেখতে খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে অপমান করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন-

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার যেকোনো ধরনের গীবতকে হারাম ঘোষণা করেছেন; যেরূপ তিনি মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়াকে হারাম করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন-

এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন আমি তার গীবত করে ফেলেছি। তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই সম্পর্কে নিচে দুইটি ঘটনা

প্রথম ঘটনা

একদিন এক সাহাবি এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললেন, সে এক আজব লোক, কেউ তাকে খাদ্য দিলে সে সব খেয়ে ফেলে, কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-রোজগার করে না। এ-কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ, কারো ত্রুটি ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন, বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে।।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গীবত

নিজের হাত-পা , চোখ ,নাক, মুখ , ইত্যাদির ইশারায় অন্য ব্যক্তির কাছে ভিন্ন কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করাটাই হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

খর্বাকৃতির এক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করল। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হাত দ্বারা তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। এটা দেখার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বললেন : হে আয়েশা, তুমি তার গীবত করলে।১৪

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

কোনো মুসলিম ব্যক্তির, তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইঙ্গিত করা বৈধ নয়; যাতে সে মর্মাহত হয়।

মুখের গীবত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন-

তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বলল হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আজ গোশত খাইনি। রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরো দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তোমরা কারো গীবত করেছ। বাস্তবিকপক্ষেই তারা এক ব্যক্তির গীবত-চর্চা করেছিল।

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর, অপর এক ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-হে লোক, তুমি দাঁত খেলাল করো। তিনি বলেলেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ, আজ আমি গোশত খাইনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এই মাত্র এক মুসলিম ব্যক্তির গোশত খেলে।

কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেওয়া কানের গীবত। শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে, তাকে এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো।

উক্ত হাদিসে তিনটি কথা স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে।

এক. কেউ যদি আপনার সামনে গীবত করে, তা হলে আপনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা করতে হবে, যাতে সে আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গীবত করতে সুযোগ খুঁজে না পায়, অথবা গীবত করতে বিব্রতবোধ করে।

দুই, এক নম্বর পয়েন্টে যদি কাজ না হয়, তা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন বাধা দেওয়ার জন্য।

তিন. আর এতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে সে স্থান ত্যাগ করতে হবে।

অন্তরের গীবত

কোনো ব্যক্তির প্রতি বিদ্ধেষবশত, মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং খোদাভীরু সৎকর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য-প্রমাণাদি ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেওয়াই হলো অন্তরের গীবত ।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান (কুধারণা) থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান (কুধারণা) গুনাহ বা পাপ।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা কোরো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, একে অপরের পেছনে পোড়ো না (পরনিন্দা করো না)... হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৬৫

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কুধারণা জঘন্যতম মিথ্যাচার।" (সহীহ বুখারী)।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা

এক ব্যক্তি কারো সমালোচনা করে বলল, আমি আল্লাহর জন্যে অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্ধেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ-কথা জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলল-ইয়া রাসুলুল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্ধেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্ধেষ

পোষণ করো? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী; সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করে না, রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য কোনো রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো দান-খয়রাত করে না, তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলল-হে আল্লাহর রাসুল, তাকে জিজ্ঞেস করুন; আমি ফরয আদায় করতে কোনোরূপ ত্রুটি করি কি না? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল-না, সে ফরয আদায়ে কোনোরূপ ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু সে নফল ইবাদত করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; তোমার জন্য সমীচীন নয়।

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না, রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রমজানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরুহ ওয়াক্তে নামায পড়ে, ইত্যাদি।

আবার অনেকেই বলে, অমুক লোককে আমি কোনোদিন সুন্নত, নফল পড়তে দেখিনি: কোনোরকম ফরজ আদায় করে চলে যায়। আপনি কি জানেন এমন কথাবার্তা বলাও একধরনের গীবত।
তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়ত, তবে কতই-না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বললেন, কতই-না ভালে হত, যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে, তা হলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

অতএব, আমাদের জন্যে উচিত নয়, কারো ইবাদত নিয়ে সমালোচনা করা। আমার ইবাদত আমার জন্যে, অন্যের ইবাদত তার নিজের জন্যেই; এর প্রতিফল দেওয়ার মালিক কেবলই আল্লাহ তাআলা।

মুসলমানের গীবত

মুসলমানের গীবত করা অকাটাভাবে হারাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো।

নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।
নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। সূরা হুযরাত -আয়াত ১২

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, কারণ আরবি 'কুম' সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

কলমের গীবত

এখন আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারো দোষ-চর্চা করতে হয় না। দোষ-চর্চা করার উদ্দেশ্যে কারো জন্যে অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। যার দোষ-চর্চা করব, তার সামনে পড়ে লজ্জিত হওয়ার ভয়ও থাকে না। কারণ উন্নত প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট আমাদের করে দিয়েছে গীবত-চর্চার সহজ পদ্ধতি; যা আপনি আমি ঘরে বসেই সম্পাদন করতে পারি। শুধু দরকার একটি এন্ড্রয়েড ফোন এবং টাইপিং-এর সামান্য সময়টুকু।

বর্তমানে প্রকাশ্য গীবত-চর্চার জন্যে ফেসবুক একটি অন্যতম অনলাইন মাধ্যম। আর গোপনে গীবত করার জন্যে মেসেঞ্জারের সুবিধা তো রয়েছেই। আরও অনেক মাধ্যম রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে ফেসবুক আর মেসেঞ্জারের ব্যবহার সাধারণত অধিক সহজলভ্য।

কলম এমন একটি অস্ত্র, যা সত্য প্রকাশে বোমার চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কলম ব্যবহার করেই মানুষের মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়া যায়। কলম সবসময় সর্বোত্তম আদেশের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সেই কলমকেই আমরা আজ গীবতের সর্বোত্তম পন্থা করে তার অপব্যবহার করে চলেছি প্রতিনিয়ত।

গীবতকারী নিজের চেহারায় নিজেই আঁচড় কাটবে

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما خرج بي مررت بقوم لهم أظفار من تحاين يخبشون وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ من هولاه يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أغراضهم

হজরত আনাস বিন মালেক রাদি, দীর্ঘদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে একান্ত খাদেম বা গৃহভৃত্য ছিলেন। একাধারে দশ বছর নিবিষ্ট মনে নবিজির খেদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আমাকে যে রাতে আকাশের মিরাজ করানো হয়, সেই রাতে আমি একদল লোক অতিক্রম করেছি, যারা নিজেরাই নিজেদের নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি হজরত

জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরা কারা?

তিনি আমাকে জানালেন, ওরা হচ্ছে সেই লোক;
যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত। তাদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠন করে বেড়াত।

গীবত করা ব্যভিচার থেকে জঘন্য পাপ

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে গীবতের অনিষ্টের প্রকটতা বুঝিয়েছেন। সেগুলোকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের মনেও গীবতের ভয়াবহ অনিষ্ট গেঁথে যাবে। মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে গীবতের অনিষ্ট উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। বাস্তবজীবনে গীবত পরিহার করার সুযোগ দান করুন।

উক্ত হাদিসে আমরা দেখেছি যে, গীবতকারীদের চূড়ান্ত পরিণতি কী দাঁড়াচ্ছে? কীভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের নখ দিয়ে নিজেদের মুখে আঁচড় কাটছে। অপর এক হাদিসে এসেছে-যদিও হাদিসটি সনদের বিচারে ততটা মজবুত নয়। কিন্তু অর্থের মানদণ্ডে সেটি বিশুদ্ধ- যেখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গীবতের গুনাহ জিনার গুনাহের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ না করুন, যদি কোনো ব্যক্তি জিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে পরবর্তীতে যখন সে অনুতপ্ত হবে, অনুশোচনা বোধ হবে, তখন সে তাওবা করে নেবে। ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমাও পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির গীবত করা হলো, যাকে অসম্মানিত করা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাফ নেই।

গীবত এমন একটি গুনাহ যা সুদ থেকেও নিকৃষ্ট

এক হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, সুদ এতটাই নিকৃষ্ট গুনাহ যে, তার মাঝে অসংখ্য অনিষ্ট রয়েছে। এই সুদ হলো অনেকগুলো গুনাহের সমষ্টি। যার সর্বনিম্ন গুনাহ হলো-আল্লাহ রক্ষা করুন- নিজের মায়ের সঙ্গে খারাপ কাজ করা। দেখুন, এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন। অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে এতটা রুঢ় শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুদ হলো, কোনো মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করবে। তাহলে দেখুন, এখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত সম্পর্কে কতটা কঠিন ধমকি দিয়েছেন।”

গীবতকারীকে জান্নাতের দরোজা থেকে ঠুকরে দেওয়া হবে

এক হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে সমস্ত লোক গীবত করে বেড়ায়, তাদের কেউ কেউ দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে অনেক ভালো আমলকারী হবে। নামাজ, রোজাসহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের বিশাল ভান্ডার নিয়ে কিয়ামতের ময়দানে উত্থিত হবে। কিন্তু যখন তারাপুলসিরাতের কাছে আসবে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুলসিরাত হলো একটি চিকন পুল। এটি জাহান্নামের ওপর দিয়ে উড়ন্ত ও ঝুলন্ত আকারে তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে এই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। জান্নাতী ব্যক্তিরা অনায়াসে এই পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে -আল্লাহ রক্ষা করুন- যাদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম, তারা সেই পুলসিরাত থেকে নিচে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। গীবতকারীকে এই পুলসিরাতের শুরুতেই আটকে দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে, তুমি সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। দুনিয়াতে তুমি যার গীবত করেছিলে, তার কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে ক্ষমা না চাইবে এবং সে তোমাকে ক্ষমা না করবে-ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

গীবতের পরিণতি বুঝাতে একটি শিক্ষণীয় স্বপ্ন

হজরত রিবয়ি নামে একজন তাবেয়ি ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমি এক স্থানে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম লোকেরা পরস্পর কথা-বার্তা বলছে। আমিও সেখানে বসে গেলাম। এক পর্যায়ে সেখানে গীবত শুরু হয়ে গেল। আমার কাছে এ অবস্থাটা অপছন্দনীয় মনে হলে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। তখন আমি সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার ধারণা হলো হয়তো সেখানে আর গীবত হচ্ছে না। তাই সেখানে গিয়ে আবার বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক কথা-বার্তা হওয়ার পর পুনরায় গীবত শুরু হয়ে গেল।

তবে এবার আমার হিম্মত কমে যাওয়ায় মজলিশ থেকে আর উঠলাম না। এখন আমি তাদের ওই গীবত শুনতে লাগলাম। আমি নিজেও তাদের গীবতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক দু' কথা বলে ফেললাম। এরপর মজলিশ শেষ হওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

রাতে শোয়ার পর স্বপ্নে দেখতে পেলাম একজন কালো ব্যক্তি আমার জন্যে বড় পেয়ালা ভর্তি গোশত নিয়ে এসেছে। আমি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেগুলো শূকরের গোশত। ওই ব্যক্তি আমাকে বললেন, গোশতগুলো খাও। আমি বললাম, শূকরের গোশত কীভাবে খাব? আমি তো মুসলমান। কীভাবে শূকরের গোশত খাব?

লোকটি বলল, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে। এরপর জবরদস্তি করে গোশতের টুকরা হাতে নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আমি যতই বাধা দিই, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে গোশতের টুকরা আমার মুখে পুরে দিতে লাগল। এক পর্যায়ে আমার মুখে বমি চলে আসছিল। তথাপি সে থামল না। এমন কঠিন অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল। এদিকে ঘুম থেকে ওঠার পর খানার সময় যখন আমি খেতে লাগলাম, তখন খাবার মধ্য থেকে

স্বপ্নের মধ্যে শূকরের গোশতের যে দুর্গন্ধ ছিল তা অনুভব হতে লাগল। এমন কি যখন যা কিছু খেতে ইচ্ছে করি তাতেই ওই দুর্গন্ধ অনুভব হতে লাগল। তিন দিন পর্যন্ত এ দুর্গন্ধ আমার অনুভব হচ্ছিল।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারলাম যে, এভাবে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি স্বল্প সময়ের জন্যে ওই মজলিশে গীবতকরেছিলে, তার শাস্তি তোমাকে তিন দিন সহ্য করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

হারাম খাবারের অন্ধকার দিক

আসল কথা হলো, আমাদের যাপিত পরিবেশের খারাবির কারণে আমাদের অনুভূতিও খারাপ হয়ে গেছে। যার কারণে আজ আমরা কোনো গুনাহকে গুনাহ মনে করার অনুভূতিও হারিয়ে ফেলেছি। হজরত মাওলানা ইয়াকুবনানুতুবিরহ.বলেন,

একবার আমি এক দাওয়াতে অংশগ্রহণ করি
সেখানে এক দু' লোকমা খাবার খেয়েছিলাম। সেই খাবার কিছুটা সন্দেহপূর্ণ ছিল। মনের ভেতর সন্দেহ দানা বেঁধেছিল যে, সেই খাবার হারাম উপায়ে উপার্জিত ছিল। সেখান থেকে এক-দু' লোকমা খাবার খেয়ে ফেলার কারণে পরবর্তীতে কয়েক মাস পর্যন্ত আমি অন্তরের ভেতর তার অনিষ্টের ভয়াল অন্ধকার অনুভব করেছি। তখন বারংবার মনের মাঝে অসৎ ইচ্ছে জেগে ওঠত। গুনাহ করার বাসনা বারংবার উদগ্র হয়ে ওঠত। গুনাহের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করতাম।

গুনাহের অনেকগুলো প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার একটি হলো, এর কারণে অন্তরের মাঝে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। সেই অন্ধকারের কারণে অন্য গুনাহ করার চাহিদা সৃষ্টি হয়। এভাবে এক গুনাহ থেকে আরেক গুনাহের দিকে মানুষের পদক্ষেপ চলে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতি শুদ্ধ করে দিন।

মোটকথা, গুনাহ হিসেবে গীবত খুবই ভয়ংকর। আল্লাহ যাকে সুস্থ অভিরুচি দান করেছেন সে ব্যক্তিই বুঝতে পারে যে, গীবতের মাধ্যমে আমি নিজের কী সর্বনাশ ডেকে আনছি। কাজেই এখন থেকেই গীবতের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে শুরু করুন।

কখন গীবত করা জায়েয?

অবশ্য এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, আমি ইতিপূর্বে গীবতের সংজ্ঞায় জানিয়ে দিয়েছি যে, গীবত হলো কারও অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার নিন্দা করা যে, সে যদি জানতে পারে যে, আমাকে নিয়ে এমন আলোচনা হয়েছে, তাহলে কষ্ট পাবে। নিন্দিত বিষয়টি বাস্তবে তার মাঝে থাকুক বা না থাকুক; সর্বাবস্থায় সেটি গীবত। তবে শরিয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু কিছু অবকাশ রেখেছে। সে সব সময় মানবপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখে ছাড় দিয়েছে। শরিয়ত কখনই মানুষের বৈধ প্রয়োজন উপেক্ষা করেনি। গীবতের ক্ষেত্রেও সে কয়েকটি বিষয়কে পৃথক রেখেছে। যদিও সেই বিষয়গুলোকে বাহ্যিকভাবে গীবত মনে হবে; কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয?

যদি কারও প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়

অবস্থাবিশেষে গীবত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, আপনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। তাকে গোপনে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে। এমতবস্থায় ওই ব্যক্তিকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব যে, তোমার জীবননাশের চক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাও। বুঝা গেল, এ ধরনের পরিস্থিতিতে গীবত করা নাজায়েয নয়।

প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত করা

একটি হাদিস রয়েছে; যার সঠিক মর্ম অনেকেই জানে না। হাদিসটি হলো, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لا غِيْبَةَ لِفَاسِقٍ وَلَا مُهَاجِرٍ»

অনেকেই মনে করে এ হাদিসের অর্থ হলো, ফাসেকের গীবত করাটা দোষণীয় নয়। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহে কবিরার মাঝে লিপ্ত থাকে, তাহলে ইচ্ছেমতো তার গীবত করা যাবে। অথবা কোনো ব্যক্তি যদি বিদআতে লিপ্ত হয়, তাহলে তার গীবত করা জায়েয। অথচ আদতে হাদিসের এ অর্থ নয়। বরং হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে যেমন, এক ব্যক্তি জনসম্মুখে মদ পান করে। এখন যদি কেউ তার অনুপস্থিতিতে এ কথা বলে যে, ওই লোকটি মদ পান করে, তাহলে গীবত হবে না। কারণ ওই ব্যক্তি নিজেই সবার কাছে বলে বেড়ায় যে, আমি মদখোর। এখন যদি তার অনুপস্থিতিতেও সে কথা বলা হয়, তাহলে সে অপছন্দ করবে না। কারণ সেই নিজেই তো সবার সম্মুখে মদ পান করে বেড়ায়। কাজেই এটি নিষিদ্ধ গীবতের তালিকায় পড়বে না।

অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গীবত করা

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি এমন এক কাজ করছে, যার কারণে অন্যদের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এখন যদি সে ব্যক্তিকে জানানো না হয় তাহলে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতবস্থায় ওই ব্যক্তিকে যদি ওই কাজের ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সে ব্যক্তি ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। সচেতন হয়ে যাবে। এটা গীবত করা জায়েয।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সর্ববিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন। হজরত আয়েশা রাদি, বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসেছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি আমাদের সামনে হাজির হলো। ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন,

«بِئْسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ».

এ ব্যক্তি তার গোত্রের খারাপ লোক।

হজরত আয়েশা রাদি, বলেন, একথা শুনে আমি জড়সড়ো হয়ে বসে গেলাম। কারণ ওই ব্যক্তি খারাপ লোক; তাই সতর্ক থাকা দরকার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমতো ওই ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথোপকথন করতে লাগলেন। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হজরত আয়েশা রাদি, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনি বললেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। তথাপি তার সঙ্গে এত সুন্দর করে নরম ভাষায় কথা বললেন, পাশে বসালেন? এ কেমন কথা!

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো। ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। কাজেই লোকেরা তার চরিত্রের খারাবি থেকে বাঁচার জন্য তাকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে ফিতনা-ফাসাদের ভয়ে তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে ও ভদ্রতা বজায় রাখে। এমনটা না করা হলে সে ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলেছি।

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে বলেছিলেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। নবিজির একথা যদিও প্রকাশ্য গীবত -কারণ ওই ব্যক্তির পেছনে তার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে- তবু এটা জায়েয। এর মাধ্যমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করাই উদ্দেশ্য ছিল। যেন ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে হজরত আয়েশা রাদি, কোনো ধরনের ফিতনার শিকার না হোন। কেননা কারও পক্ষ হতে কোনো ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া গীবত নয়। এমনটি করা জায়েয।

ফাসেক-পাপাচারীর গীবত করা জায়েয নয়

হজরত থানভি রহ. বলেন, কোনো এক মজলিশে হজরত উমর রাদি-এর ছেলে আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি উপস্থিত ছিলেন। ওই মজলিশে এক ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মন্দ কর্মগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করতে লাগল।

হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদি ওই ব্যক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যে তার নিন্দা আলোচনা করছ তাতো গীবত। তুমি এটা মনে করো না যে, হাজ্জাজের গর্দানের ওপর এত মুসলমানের রক্ত; তাই হাজ্জাজের গীবত করা হালাল হয়ে যাবে। মূলত বিষয়টি এমন নয়। বরং হাজ্জাজের গর্দানের ওপর যত মুসলমানের রক্ত রয়েছে তার হিসাব আল্লাহ তাআলা তার থেকেই নেবেন। আর তোমার এ গীবতের হিসাবও তখন তোমার থেকে নেবেন যা তুমি তার ব্যাপারে এখন করছ। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

এ কথা ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই যে, অমুক ব্যক্তি ফাসেক, আমলে বিদআত করে। কাজেই যত ইচ্ছা তার গীবত করে নেবে; বরং এ ধরনের গীবত থেকে নিজেকে দূরে রাখো। কেননা এগুলো পরিহার করাও অপরিহার্য।

জালিমের জুলুমের কথা আলোচনা করা গীবত নয়

শরিয়ত আরও একটি স্থানে গীবত করার অনুমতি দিয়েছে। তাহলো, ধরুন, কোনো এক ব্যক্তি আপনার ওপর জুলুম করল। এখন আপনি যদি সেই কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে বলেন যে, আমার সঙ্গে এই এই জুলুম করা হয়েছে। এভাবে সে আমার ওপর অবিচার করেছে। তাহলে এটি গীবত হবে না। এর কারণে গুনাহ হবে না। আপনি যার কাছে আপনার জুলুমের খতিয়ান পেশ করছেন। সে ব্যক্তি ওই জুলুমের প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক: সর্বাবস্থায় এটি গীবত হবে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি আপনার কোনো কিছু চুরি করেছে। এখন আপনি থানায় নালিশ করে এলেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার এ জিনিস চুরি করেছে। তাহলে এভাবে আপনার নালিশ করাটা যদিও ওই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার নিন্দালোচনা হচ্ছে: কিন্তু এটি গীবতের আওতাভুক্ত হবে না। কেননা, আপনার ওপর অবিচার করা হয়েছে।

لا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الأَمَنْ ظُلِم(َ

আল্লাহ তাআলা এ কথা পছন্দ করেন না যে,
কোনো নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হবে। তবে ওই ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম, যার সঙ্গে জুলুম করা হয়েছে।

এটি গীবত নয়। এটি সর্বাবস্থায় জায়েয।

আমরা কয়েকটি ব্যতিক্রম অবস্থার কথা আলোচনা করলাম যেগুলোকে আল্লাহ গীবত থেকে আলাদা রেখেছেন। যেখানে গীবতের গুনাহ হবে না। কিন্তু এই ব্যতিক্রম অবস্থাগুলোর বাইরেও আমরা সর্বদা আমাদের মজলিশে গল্পচ্ছলে, সময় কাটানোর অজুহাতে অন্যদের নিন্দা-সমালোচনার প্রলম্বিত ফিরিস্তি তুলে ধরি। যার সবগুলোই গীবত। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের ওপর দয়া করুন। এই বিষয়গুলো পরিহার করতে সচেষ্ট হোন। এগুলোকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবতের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন।

অন্যদের আলোচনা না করাই উত্তম

এ কারণে হাকিমুল উম্মাত হজরত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, অন্য কারও ব্যাপারে আলোচনাই করবে না। ভালো-মন্দ কোনো আলোচনাই করবে না। কেননা ভালো আলোচনা করতে গিয়ে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একথা বলা অসম্ভব কিছু নয় যে, অমুক ব্যক্তি খুব ভালো তবে তার এ কাজটা একটু খারাপ। এজন্য উত্তম পন্থা হলো, কারও ব্যাপারে কোনো প্রকার আলোচনাই না করা।

নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো

ভিন্ন কোনো মানুষের আলোচনা করার কি প্রয়োজন? নিজের চিন্তা নিজে করো। কবির ভাষায়-

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی ٹیر تو

যে ব্যক্তি নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে তার অন্যের ব্যাপারে আলোচনা সমালোচনা করার সময় কোথায়? যে ব্যক্তি নিজে অসুস্থ, পেটের ব্যথায় কাতর-তার আবার অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হবার সুযোগ কোথায়?

যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে যে, আমার মাঝে এত এত দোষ-ত্রুটি রয়েছে, কীভাবে তা থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি। এ ধরনের চিন্তায় চিন্তিত ব্যক্তি কখনো অন্যের গীবত করার সুযোগ পাবে না। প্রয়াত মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর চমৎকার একটি কবিতা লিখেছেন-

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر

رہے ڈھونڈتے اور وں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر

تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

যখন নিজের ওপর নজরদারি থাকবে, তখন কোনো ব্যক্তির অন্য কারও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের দোষ-ত্রুটির খোঁজ-খবর নেওয়ার এবং তার সংশোধনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফিক দিন। আমিন।

গীবত থেকে পরিত্রাণের একটি বাস্তবাশ্রিত নির্দেশনা

গীবত থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে হজরত থানভি রহ. একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যদি 'সালেক' তথা আত্মসংশোধনে ইচ্ছুক ব্যক্তির সামনে কোনো ব্যক্তি কারও গীবত করে বা অর্থহীন কথা বলে আর সালেক তাকে নিষেধ করার মতো ক্ষমতার অধিকারী না হয়, তাহলে সে যেন সেখান থেকে উঠে যায়। সে যেন ওই ব্যক্তির মন ভাঙার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে। কেননা অন্যের মন ভাঙার খেয়াল করা অপেক্ষা নিজের দীন ভাঙার খেয়াল করাটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। আর যদি সে বিনা কারণে উঠতেও সক্ষম না হয় তাহলে যেন কোনো বাহানা দেখিয়ে উঠে যায়। অথবা ইচ্ছেকৃতভাবে কথার মোড় কোনো বৈধ প্রসঙ্গের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। যেন গীবতের প্রবাহে ছেদ পড়ে।

আমি পূর্বেই জানিয়েছি যে, যেভাবে গীবত বলা জায়েয নয়, তদ্রুপ গীবত শোনাও জায়েয নয়। কাজেই যদি কারও কোনো মজলিশে গীবত শুরু হয়ে যায় তাহলে প্রথমে কী করতে হবে? হজরত থানভি রহ. বলেন, যদি তাকে বারণ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে বারণ করো। বারণ করার দুই পদ্ধতি। একটি হলো, পরিষ্কার বলে দেবে যে, দেখো, এভাবে কারও প্রসঙ্গে আলোচনা করা গীবত। এ প্রসঙ্গ ছাড়ুন, অন্য প্রসঙ্গে কথা বলুন। যদি এভাবে বলা সম্ভব না হয়, তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতি ধরুন। তাহলো, কথার প্রসঙ্গ বদলে দিন। অন্য কোনো প্রসঙ্গ তুলুন। কাহিনি খতম। যদি এই দুই পদ্ধতির কোনোটি আমলযোগ্য না হয় তাহলে সেখান থেকে উঠে যান। সেই মজলিশে বসে থাকবেন না।

এক্ষেত্রে কারও মন ভাঙার ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না

এরপর হজরত রহ. একটি মূলনীতি বলেছেন। তাহলো, এক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট পাওয়ার পরোয়া করবে না। কেননা এক্ষেত্রে কারও দিলে কষ্ট পাওয়ার পরোয়া করতে গেলে নিজের দীন ও শরিয়ত নষ্ট হবে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা জরুরি।

অতি বাড়াবাড়ি আর অতি ছাড়াছাড়ি উভয়টাই প্রান্তিক কাজ। একদল হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এতটাই ছাড় দিচ্ছে যে, কোনো পরোয়াই করছে না। অন্যের জীবন সম্পর্কিত অধিকার, মাল সম্পর্কিত অধিকার; সবই ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। আরেকদল হুকুকুল ইবাদের ক্ষেত্রে এতটাই বাড়াবাড়ি করে যে, তা পালন করতে গিয়ে অনেক সময় নিজের শরয়ি ফরজ পালনের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা দেখায়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা

এক ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমার নিকট এসে তার স্বামীর খুব প্রশংসা করতে লাগলেন যে, আমার স্বামী অনেক ভালো মানুষ। তবে ডাক্তারি পেশার দরুন সময়মতো নামাজ আদায় করতে পারে না। আমি আমার স্বামীকে বলেছি নামাজের সময় হলে নামাজটুকু আদায় করে নিয়ো। জবাবে তিনি বললেন, আমি তো মানুষের সেবায় ব্যস্ত থাকি। আর এটা হলো হুকুকুল ইবাদ। চেম্বারে রোগী বসে থাকবে আর আমি নামাজ আদায় করব?
সুতরাং তিনি আছর, মাগরিব, এশা বাড়িতে এসে একসঙ্গে আদায় করেন। আর বলেন, যে আমি তো খিদমতে খলক (সৃষ্টির সেবা করছি। আর খিদমতে খলক করতে গিয়ে নামাজ আদায় করতে না পেরে কাজা হলে কোনো অসুবিধা নেই।

কী আশ্চর্য কথা। খেদমতে খলক [সৃষ্টির সেবা। তোমার ওপর ফরজে আইন নয়। পক্ষান্তরে নামাজ তোমার ওপর ফরজে আইন তথা ঐকিক অবধারিত দায়িত্ব। অন্যের সেবা করার সঙ্গে নামাজ আদায়ের কোনো বৈপরীত্ব নেই। যদি তুমি আসরের নামাজ পড়ে দ্বিতীয়বার রোগী দেখা শুরু করো তাহলে কোন সমস্যাটা হবে? এটি

হলো নামাজ কাজা করার পক্ষে মনের তৈরি বাহানা মাত্র। এ হচ্ছে অতিবাড়াবাড়ি ও অতি ছাড়াছাড়িপ্রসূত প্রান্তিকতাশ্রিত সিদ্ধান্ত। দীনের সঠিক বোধ না থাকলে যা হয়। এজন্য হজরত থানভি রহ, ইরশাদ করেছেন, অন্য কারও অন্তর ভেঙে যাবে এ অজুহাতে নিজের শরিয়ত নষ্ট করা ঠিক হবে না। কাজেই একথা মনে করা যে, যদি আমি তাকে গীবত থেকে বাধা প্রদান করি তবে সে মনে কষ্ট পাবে। বা আমি এ গীবতের মজলিশ থেকে উঠে গেলে সে মনে কষ্ট পাবে। স্মরণ রেখো। যদি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য কারও দিলে চোট লাগে লাগুক, এর পরোয়া করা যাবে না। তোমাকে অবশ্যই জায়েয বিষয়গুলো মানতে হবে। হ্যাঁ জায়েয বিষয়ের ক্ষেত্রে কারও মনে আঘাত করবে না। তবে যেখানে মন রক্ষা করতে গেলে গুনাহে জড়াতে হবে এসব ক্ষেত্রে মন রক্ষা করে গুনাহে জড়াবে না; বরং কোনো পরোয়া করবে না।

গীবত থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হজরত থানভি রহ. বলেন, অনেক লোক আমার নিকট এসে বলেন-আমি আপনার ব্যাপারে গীবত করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আমি তাকে বলি, তুমি আমার ব্যাপারে যা বলেছ এই শর্তে আমি মাফ করব যে, তা আমার নিকট প্রকাশ করো। যেন আমি জানতে পারি আমার কি ভুল হয়েছে। যদি তুমি আমাকে বলে দাও তাতে আমি সংশোধন হতে পারব। আমার নিকট ওই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। হতে পারে তোমার এ আলোচনার ফলে আমার ভুল ভেঙে যেতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, আমার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সঠিক। তবে ঘটনাক্রমে আমার ভুল কাজটি হয়ে গেছে। আর জিজ্ঞেস করার দরুন আমার ভুল কর্মটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ওই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দেবেন।

যদি গীবতের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন এর প্রতিকার হলো, গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট একথা বলা যে, আমি আপনার গীবত করেছি। এর দ্বারা নিজের অন্তরের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। অবশ্য এটা কঠিন কাজ। তবে এটাই গীবত থেকে বাঁচার মহৌষধ। দু' চারবার এটা করলে আগামী দিনগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হয়ে যাবে।

বুজুর্গানে দীন গীবত থেকে বাঁচার অপর আরেক কৌশল উল্লেখ করে থাকেন। যেমন হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন, যখন কারও গীবত করে থাকবে তখন নিজেরই দোষ-ত্রুটিগুলো আলোচনা করতে থাকো। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান। ভুল-ভ্রান্তি থেকে কোনো ব্যক্তি মুক্ত নয়। কাজেই অমি যার ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করছি এমন ভুল তো আমারও থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে গীবতকারীর ব্যাপারে যে শাস্তির কথা আল্লাহ তাআলা চরম হুঁশিয়ারির সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ একটি শব্দ মুখ দিয়ে বের করার কারণে এর ফলাফল কতইনা নিকৃষ্ট।

এ ছাড়া আল্লাহর নিকট গীবত থেকে হেফাজত থাকার প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ, আমাকে গীবত থেকে মুক্তি দান করুন। যদি কখনো মজলিশে কারও গীবত করে ফেলো তাহলে মজলিশ থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে হে আল্লাহ, এ মজলিশে যে আলোচনা হয়েছে আমাকে তা থেকে মুক্তি দান করুন। আমি যেন এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত না হই।

নিজের রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা পরস্পর কুস্তিতে মত্ত ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ-অবস্থায় দেখে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কুস্তিগীর কে? সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম বললেন, সে অমুক কুস্তিগীর। তার সাথে যে কুস্তিতে লড়ে সে-ই ভূপাতিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদের ওই ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দেবো না, যে এই কস্তিগীরের চেয়েও অধিক শক্তিশালী? সে ব্যক্তি, যার উপর অন্য ব্যক্তি অত্যাচার করেছে অতঃপর সে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছে, ফলে সে তার শত্রুর উপর ও তার শয়তানের উপর জয়ী হয়েছে এবং তার বন্ধুর শয়তানের উপরও বিজয়ী হয়েছে।

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মেটানোর জন্য আমরা একে অপরের গীবত সবচেয়ে বেশি করে থাকি। অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির উপর রুষ্ট হলে, উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আমরা তার দোষ বর্ণনা করতে আরম্ভ করি। তার উপর মনের সমস্ত ক্ষোভ মেটাতে থাকি। এ ক্রোধ বা রাগ, গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ। আর তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ব্যক্তিগত যেসব বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলেছেন তার মধ্যে রাগ অন্যতম।

গীবত পরিহারে রাগ নিয়ন্ত্রণ একটি অবশ্যকর্তব্য। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত এমনসব কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়, যা শুধু গীবত-পরনিন্দাই নয় বরং কুফরী পর্যন্ত চলে যায় বা যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো এবং শেখানো পথ ও পদ্ধতিই সর্বোত্তম কর্মযোগ্য।

যেমন:

এক. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

দুজন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে পরস্পর গালাগাল করছিল, তাদের একজনের চোখ লাল হয়ে গেল এবং শিরা ফুলে উঠল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি একটি বাক্য জানি, যদি কেউ তা পড়ে, তার এ অবস্থা কেটে যাবে। সে বাক্যটি হলো, আমি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দুই, শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'যখন তোমাদের কারো রাগ হয় তখন সে যদি দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন সে বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায়, ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।

তিন. অযু করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

'নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, সে যেন অযু করে।'

চার, চুপ থাকা।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো, কঠিন করো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো, যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো-এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার কথাটি উচ্চারণ করেছেন।

কুরআন ও হাদিসে রাগ দমনের একাধিক উপকারিতা বর্ণনায় এসেছে। রাগ দমনের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

তুমি রাগ করো না, তা হলে তোমার জন্যে জান্নাত।

আল্লাহ তাআলা রাগ দমনকারীকে ভালোবাসেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

এবং যে রাগ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে, আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

সব রাগ নিন্দনীয়, তবে সব রাগ দোষের নয়। কিছু রাগ এমন রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। মূলত রাগ দুই প্রকার। নিন্দনীয় রাগ নিন্দনীয় রাগ হচ্ছে সেসব জাগতিক রাগ, যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি আলোচ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। প্রশংসনীয় রাগ সেসব রাগ প্রশংসনীয়, যা আল্লাহ তাআলা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দ্বীনের স্বার্থে করা হয়।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজের কোনো ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে, তার জন্যে যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।

মোটকথা, গীবত পরিহারে আমাদের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যেভাবেই হোক রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

অনর্থক কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক পরিহার করুন

দুনিয়ার জীবনে মানুষ নিজ হাতে সৃষ্ট যত বিপদে পড়ে, অনেকাংশেই সেগুলো তার কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। পাশাপাশি এর পরকালীন অনিষ্ট তো রয়েছেই। দুনিয়া ও পরকালের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে স্বভাবধর্ম ইসলাম স্বল্পভাষিতাকে উৎসাহিত করেছে। হাদীস শরিফে বর্ণিত হয়েছে এর নানাবিধ উপকার ও গুরুত্বের কথা। পাশাপাশি আলোচনা হয়েছে অধিক কথা বলা এবং অনর্থক তর্কের ক্ষতির বিষয়টিও।

আমরা যদি আমাদের সামাজিক জীবনাচরণের দিকে খেয়াল করি, তা হলে দেখব, যারা কথা বেশি বলে, অনর্থক তর্কে জড়ায়, সমাজের চোখে তাদের মর্যাদা খুব একটা উন্নত নয়। কারো কারো ক্ষেত্রে 'কথা বেশি বলা' অন্যদের নিকট মহা যন্ত্রণার কারণ বিবেচিত হয়। আর যেসব লোক কথার চেয়ে কাজের প্রতি মনোযোগী হয় বেশি, তাদের আলাদা এক মর্যাদার স্থান থাকে সবার মাঝে; ধন-সম্পদ তার যেমনই থাকুক না কেন।

সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে নীরব থাকে, সে মুক্তি পায়। ২

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যখন মন্দ বা অনর্থক কথা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তখন সে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। নিষ্কৃতি পায় জাহান্নামের আযাব থেকেও। আমাদের দেখা একটি বাস্তবতা হচ্ছে, যখন কেউ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলে, অনর্থক তর্কে জড়ায়, তখন সে যে কেবল অনর্থক কথাই বলে বেড়ায় এমন নয় বরং সে নানান রকম অন্যায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

যারা বেশি কথা বলে, অনর্থক তর্কে জড়ায়, তারা মানুষের গীবত, পরনিন্দায় লিপ্ত হয় বেশি। অবচেতনভাবেই তারা অনেকের গীবত করতে থাকে এবং এ গীবত, পরনিন্দার কারণে অনেক সময় কারো সম্মানহানিও করে ফেলে। কখনো আবার দুই

ব্যক্তির মাঝে সম্পর্কও নষ্ট হয়। অহেতুক তর্ক দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি, যাতে দুনিয়া বা দীনের কোনো রকম ফায়দা অর্জিত হয় না।
তবে অনেক বিতর্ক আছে এমন, তা শুধু জায়েযই নয়, উত্তমও বটে। এ ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হওয়া প্রকৃত তালিবে ইলম অথবা ভালো মানুষের পরিচয়।

মোটকথা, গীবত পরিহার করার জন্যে কথা কম বলা, অনর্থক তর্ক-বিতর্কে জড়ানো মোটেও উচিত নয়।

গীবতের কাফ্ফারা

কয়েকটি হাদিসে গীবতের কাফফারা সম্পর্কে বিধান এসেছে। যদিও অনেকে এগুলোকে 'দুর্বল' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন; তবে অর্থের বিচারে এগুলো সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। কারও গীবত হয়ে গেলে তার জন্য খুব দুআ-ইসতেগফার করবে এবং নিজের ওপর এ প্রত্যয় করে নেবে যে, আজ আমি যাদের গীবত করলাম, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আর কারও গীবত করব না। অতীতে যাদের গীবত করা হয়েছে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চেয়ে নিবে - বলবেন আমি আপনার ব্যাপারে এধরনের কথা বলেছিলাম ,আপনি আমাকে মাফ করে দিন । আশা করি ওই ব্যক্তি মাফ করে দেওয়ার কারনে আল্লাহ তায়ালা ও মাফ করে দেবেন এবং তাদের জন্য দুআ-ইসতেগফার করবে।

হৃত অধিকারের প্রতিকার কীভাবে করবেন?

হজরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. ও আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হজরত মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. একটি কাজ করেছিলেন। তারা প্রত্যেকের কাছে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তারা লিখেছিলেন, জীবনে-জানা নেই- কত জনের যে অধিকার নষ্ট করেছি। কত-শত ভুল করেছি। আমি সামষ্টিকভাবে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ

করে দিন। তাঁরা সকল আত্মীয়স্বজনের কাছে এভাবে চিঠি লিখে প্রেরণ করেন। আশা করি, এর কল্যাণে আল্লাহ তাআলা তাদের মাফ করে দিয়েছেন।

যদি আপনি এমন কারও অধিকার নষ্ট করে থাকেন, যাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। যেমন, মৃত্যু বরণ করেছেন অথবা অন্যত্র চলে গেছেন। এখন ঠিকানা জানা নেই। তাহলে এমতবস্থার জন্যে হজরত হাসান বসরি রহ. একটি পরামর্শ দিয়েছেন। তাহলো, যাদের গীবত করা হয়েছিল বা যাদের অধিকার নষ্ট করেছ, তাদের জন্যে খুব বেশি দুআ করবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ, আমি তার যেই গীবত করেছিলাম, সেটিকে তার জন্যে পরকালীন উন্নতির কারণ বানিয়ে দিন। তাকে এর জন্যে দীন-দুনিয়ার উন্নতি দান করুন। তার জন্যে খুব বেশি তাওবা-ইসতিগফার করুন। এটিও প্রায়শ্চিত্ত করার একটি পদ্ধতি।

আজ যদি আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে এভাবে পত্র প্রেরণ করি তাহলে কি আমরা এর কারণে ছোট হয়ে যাব? এতে কি আমাদের অপমান হবে? আদৌ নয়। হতে পারে, এমন একটি পদক্ষেপ আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির কারণ হবে।

ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফজিলত

হাদিস শরিফে এসেছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা অন্য কোনো বান্দার কাছে ক্ষমা চায় এবং বাস্তবেই সে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন যদি ওই ব্যক্তি তার এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা দেখে ভাবে যে, হায় হায়, এ ব্যক্তি নিজেকে কতটা অনুতপ্ত বানিয়েছে, আমি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ তাআলা সেই ক্ষমাকারী ব্যক্তিকে সেদিন ক্ষমা করে দেবেন, যেদিন সে ক্ষমার সবচেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী হবে। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি যদি এভাবে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা সত্ত্বেও ক্ষমা না করে। তাহলে আল্লাহ তাআলাও ওই ব্যক্তিকে ওই দিন ক্ষমা করবেন না, যেদিন সে ক্ষমার সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। বলবেন, তুমি আমার বান্দাকে মাফ করনি, আমি কীভাবে তোমাকে মাফ করি?

কাজেই এটি খুবই বিপজ্জনক একটি পর্যায়। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি অনুশোচনা ও অনুতাপ নিয়ে অন্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালন করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্ষমা করল কি করল না, তাতে কিছু যায়-আসে না। কাজেই অন্যদের কাছে সব সময় অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনা :

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে নববিতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ করে বললেন, আমি নিজেকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করছি। যদি তোমাদের কেউ আমার পক্ষ হতে কোনো কষ্ট পেয়ে থাকো, তাহলে তার বদলা নিয়ে নাও। অথবা মাফ করে দাও। যেন কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো হক আমার ওপর বাকি না থাকে।

দেখুন। উভয় জগতের সরদার জনাব মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যাঁর একটি নিঃশ্বাসের জন্যে সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের জীবন পর্যন্ত বিলীন করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন- এভাবে সাহাবিদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে জনৈক সাহাবি দাঁড়িয়ে অভিযোগ পেশ করলেন হে আল্লাহর নবি, একদা আপনি আমার কমরের ওপর মেরে ছিলেন। আজ আমি এর বদলা নিতে চাই। একথা শুনে নবিজি তিনি নিজের কমর পেতে দিয়ে বললেন-তুমি তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ করো।

সাহাবি বললেন, যখন আপনি আমাকে মেরে ছিলেন তখন আমার শরীর অনাবৃত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, এবার তোমার বদলা নিয়ে নাও।

এ সুযোগে সাহাবি উঠে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে থাকা মোহরে নবুয়তে চুম্বন এঁকে দিলেন। অতঃপর সেই সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। আজ আমার এ গোস্তাখি করার কারণ হলো, আমার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার মোহরে নবুয়তে চুম্বন করব। এ সুযোগটুকু গ্রহণ করার জন্য আমার এ কৌশল। আমাকে আপনি মাফ করে দিন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অতিশয় কোমল ও ক্রোধমুক্ত মহান হওয়া সত্ত্বেও সাহাবিদের নিকট যেভাবে মাফ চাইলেন, সেখানে আমরা তাঁর উম্মত হয়ে একে অপরের কাছে মাফ চাইতে অসুবিধা কোথায়? নিজের পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠালে কি আকাশ ভেঙে পড়বে? এতে বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করা হবে। সুন্নত অনুসরণের ফলে এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন।

গীবত থেকে আত্মরক্ষার সহজ উপায়

হজরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন, গীবত থেকে বাঁচার সহজ পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তির ভালো-মন্দ কোনো বিষয়ের আলোচনা না করা। ব্যক্তির ভালো কিংবা মন্দ যে কোনো বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকা। কেননা কোনো ব্যক্তির ভালো দিকগুলো আলোচনা করার সময় মনে হবে আমি তো ওই ব্যক্তির গীবত করছি না বরং ভালো বিষয়গুলো আলোচনা করছি। অথচ দেখা গেল ভালো দিকগুলো আলোচনা করতে করতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সত্য-মিথ্যার মিশেল ঘটিয়ে এমন কোনো শব্দ মুখ ফসকে বলে ফেলবে। যা এতক্ষণের শুভ আলোচনাকে মুহূর্তেই মন্দের ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। যেমন, বলল-ওই ব্যক্তির সমস্ত কাজ-কারবার ও আচার-ব্যবহার সবই ভালো তবে ওই কাজটি।। এই কিন্তু বা তবে শব্দটুকু বলে ওই ব্যক্তির সমস্ত প্রশংসনীয় ভালো কাজগুলোও মন্দে রূপান্তর করা হলো। এভাবে গীবত হয়ে গেল।

এজন্য হজরত থানভি রহ. বলেছেন, কারও ভালো-মন্দ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না। একান্তই যদি কারও ভালো দিক নিয়ে আলোচনা করতে হয় তবে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে আলোচনা করবে যাতে কোনো দোষ-ত্রুটি কথার ফাঁকে এসে না যায়।

নিজের ভুলগুলোর ওপর দৃষ্টি দিন

আরে ভাই। অন্যের দোষ চর্চা কেন করো? সর্বাগ্রে নিজের ওপর নজরদারি করো। অন্যের অপরাধে তোমার ওপর শাস্তি বর্তাবে না। তোমার অপারাধের শাস্তিও অন্যের ওপর বর্তাবে না। কাজেই নিজের সংশোধনের প্রতি নিজেই মনোযোগী হও। কবি বলেছেন,

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

নিজের ওপর খেয়াল রাখবে, নিজের দোষ সম্পর্কে সজাগ থাকবে। অন্যের দোষ-ত্রুটি চর্চা মানুষ তখনই করে যখন নিজের দোষ নিজে দেখতে পায় না। মানুষ যখন

নিজের কৃত অপরাধের দিকে খেয়াল রাখে তখন অন্যের অপরাধের দিকে তার খেয়াল থাকে না।

প্রয়াত মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর চমৎকার একটি কবিতা লিখেছেন,

رہے ڈھونڈتے اوروں کی عیب وہنر

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خب،

تو نگاہ میں کوئی برانہ رہا

پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر،

যখন ছিল না নিজের ভেতরের কোনো খবর, তখন বেশ খুঁজে বেরিয়েছি, কী করছে আজ অপর। অতঃপর যখন পড়ল নজর নিজের দোষের ওপর তখন বুঝেছি, জগতের সব ত্রুটি আমারই ভেতর।

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের অন্তরে নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ রাখার মানসিকতা ও অনুভূতি জাগ্রত করে দিন। আজ পৃথিবীর বুকে যেই অরাজকতা ও অস্থিরতা চলছে; তার অন্যতম কারণ হলো, আজ আমাদের সবার দৃষ্টি অন্যের ওপর। নিজের প্রতি কারও কোনো মনোযোগ নেই। আজ আমাদের মনে নেই যে, আমাদেরকে কবরে যেতে হবে। আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে; বরং সময় পেলেই আমরা অন্যদের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনামুখর হয়ে পড়ি। অমুকে মাঝে এ দোষ, তমুকের মাঝে ওই দোষ। এভাবে আমরা দিন-রাত আবর্জনা নিয়ে পড়ে আছি। আল্লাহর ওয়াস্তে এমন আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করুন।

আলোচনার গতি বদলে দিন

আজ আমরা যেই পরিবেশ-পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, তার মাঝে অবস্থান করে গীবত থেকে আত্মরক্ষা করাটা যদিও কঠিন; কিন্তু অসম্ভব নয়। কেননা

বাস্তবিকপক্ষেই যদি সেটি মানবসাধ্যের বাইরে হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা কখনই আমাদের জন্যে গীবত হারাম করতেন না। বুঝা গেল, এর থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। কাজেই যদি কোনো মজলিশে আলাপচারিতার বিষয়বস্তু গীবতের দিকে মোড় নিতে শুরু করে, তাহলে মোড় নিতে দেবেন না; বরং সেটিকে পূর্বের দিকে ফিরিয়ে নেবেন। যদি ভুলক্রমে মুখ ফসকে কারও গীবত বেরিয়ে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা- ইস্তেগফার করে নিতে হবে ।

গীবতের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, শুনলে অসন্তুষ্ট হবে

এক ব্যক্তি হজরত থানভি রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কারও সঙ্গে অকৃত্রিম সম্পর্ক থাকে, বন্ধুত্ব থাকে, তখন তার সঙ্গে কথাচ্ছলে হাসি-মজা হয়ে থাকে। এই হাসি-মজার ভেতর দিয়ে পরস্পরে অনেক ধরনের কথা বিনিময়ও হয়ে থাকে। এখন যদি তার অনুপস্থিতিতে কোনো ধরনের ভণিতা না করে তার সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলে ফেলা হয়; যে কথা যদিও বাহ্যত এমন যে, যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সে কথা শুনবে, তখন তার অপ্রিয় মনে হবে যে, আমার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারল। কিন্তু সম্পর্কের ধরন এমন যে, তার সঙ্গে ভণিতাহীন অকৃত্রিম বন্ধুত্ব রয়েছে।

বন্ধন রয়েছে। তাহলে এমতবস্থায় ওই ধরনের কথা বলা জায়েয হবে কি না? ওই বাক্যগুলো কি গীবত প্রতিপন্ন হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে হজরত থানভি রহ. বলেন,

যদি এ কথার শতভাগ নিশ্চয়তা থাকে যে, যার সম্পর্কে আমি এ কথা বলেছি সে যদি শুনতে পায়, তাহলে আমার এ বাক্য, আমার এ শব্দ, আমার এ মন্তব্য তার কাছে অপ্রিয় মনে হবে না। সে খারাপ মনে করবে না। কেননা তার সঙ্গে সম্পর্কের ধরনটাই এমন যে, ওই শব্দগুলো গীবতের সংজ্ঞায় পড়ে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, দোস্ত, তুই বড় অকৃতজ্ঞ। এরপর পরবর্তীতে কোনো এক মজলিশে কথাপ্রসঙ্গে সেই বন্ধুর আলোচনা ওঠল। তখন সে বলে ফেলল, আরে ওই

অকৃতজ্ঞতার কি কোনো ধর্তব্য আছে? দেখুন, এই 'অকৃতজ্ঞ' শব্দটা এমন যে, যদি কোনো অপরিচিত ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে নির্ঘাত সে অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দ সাধারণত কোনো দাগ কাটে না। কাজেই তা গীবতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এর বিপরীতে যদি তার অসন্তুষ্ট হওয়ার সংশয় থাকে অর্থাৎ এ সম্ভাবনা থাকে যে, সে শুনতে পেলে অসন্তুষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, অসন্তুষ্ট না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে এমতবস্থায় এ জাতীয় কথা বলাকে নাজায়েয ধরে নেওয়া হবে।

এমন হাসি-ঠাট্টা জায়েয নয়

বুঝা গেল, অনেক সময় বন্ধুমহলে এমনও হয়ে থাকে যে, এক বন্ধু অবলীলায় অন্য বন্ধুর সঙ্গে হাসি-মজা করে থাকে। সেখানে একজন আরেকজনের সঙ্গে দুষ্টুমি-খুনসুটি করে থাকে। কিন্তু এর কারণে কেউ কারও কথায় কষ্ট বোধ করে না। কষ্ট দেওয়াও উদ্দেশ্য হয় না। তবে কিছু লোক এমন হয়ে থাকেন, যারা হাসি-মজা মেনে নিতে পারেন না। যার কারণে ছোট্ট কথাতেও তেতে উঠে। রাগ করে বসে। তখন দেখা যায়, এমন লোককে রাগানোর উদ্দেশ্যে বন্ধু-বান্ধবরা হাসি-মজার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাথেকে মজা নেয়। এখন যদিও বন্ধু-বান্ধবরা তার সঙ্গে ভণিতা না করে অবলীলায় ঠাট্টাচ্ছলে আজে-বাজে কথা বলছে; কিন্তু যেহেতু এতে তার কষ্ট হচ্ছে, কাজেই এ ধরনের হাসি-মজা জায়েয নয়। কেননা কোনো মুসলমানকে তার অপ্রিয় ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়। কাজেই যখন এ ধরনের মানুষের সঙ্গে ওই জাতীয় কথা-বার্তা তার মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কাজেই তা জায়েয নয়।

কিন্তু যদি এ নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে আমার অকৃত্রিম ও ভণিতামুক্ত সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমার এ কথা তার খারাপ লাগবে না। সে ইতিবাচকভাবে নেবে। কষ্টবোধ করবে না। তাহলে এমতবস্থায় এ জাতীয় কথা তার

সামনেও বলা যাবে, পেছনেও বলা যাবে। উভয়টাই জায়েয। মোটকথা, এখানে তিনটি সুরত দাঁড়ায়-

১. যদি তার অপ্রিয় হওয়ার প্রবল বিশ্বাস থাকে, তাহলে নাজায়েয।

২. যদি তার অপ্রিয় হওয়ার সন্দেহ থাকে, তাহলেও নাজায়েয।

৩. যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, সে অপছন্দ করবে না, তাহলে জায়েয।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচার হিম্মত ও তাওফিক দান করুন।

গীবতকে জায়েয করার জন্য নফসের বাহানা

এক ব্যক্তি হজরত থানভি রহ.-এর নিকট পত্র লিখে জানালেন যে,

হাদিস শরিফে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন যার গীবত করা হয়েছে, তাকে গীবতকারীর আমলনামা থেকে গীবতের অঙ্ক পরিমাণ সাওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। এই হাদিসের কারণে আমার নফস আমাকে এ বাহানা শেখাচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন যখন আমাকে আমার গীবতের জন্যে পাকড়াও করা হবে, তখন আমি আমার গীবতকারীদের কাছ থেকে সাওয়াব নিয়ে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেব।১৬

বাহানার জবাব

জবাবে হজরত বলেন-

প্রথম কথা হলো, এ কথা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় যে, অন্যের কাছ থেকে গীবতের প্রতিদান হিসেবে আপনি যে পরিমাণ সাওয়াব পাবেন, সেই সাওয়াব আপনার প্রায়শ্চিত্ত করতে যথেষ্ট হবে। হতে পারে অন্যদের কাছ থেকে যে সাওয়াব

পেয়েছ তা তোমার কাছে থাকবে আর তোমার নিজের সাওয়াবগুলো অন্যদের দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর নাজাতের জন্যে প্রয়োজনীয় আর কোনো সাওয়াব থাকবে না। দ্বিতীয় কথা হলো, উভয় ধরনের সাওয়াব যে সমান সমান হবে, এর পক্ষেও কোনো দলিল নেই। হতে পারে, তোমার কাছ থেকে কম পাওয়া যাবে আর তোমার থেকে তার চেয়ে বেশি নেওয়া হবে। তখন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে কীভাবে যথেষ্ট হবে?'১৭

অর্থাৎ তোমার কাছে কি এমন কোনো দলিল আছে যে, গীবতকারীদের কাছ থেকে তুমি যেই সাওয়াব পাবে শুধু সেই সাওয়াবটুকুই অন্যদের কাছে যাবে। এমনও তো হতে পারে যে, তোমার নামাজ, তোমার রোজা, তোমার তিলাওয়াত, তোমার জিকির ইত্যাদি সবই তোমার গীবতের কারণে অন্যদের কাছে চলে যাবে। অন্যদের কাছ থেকে যেই সাওয়াব তোমার কাছে এসেছে, তা তোমার চলে যাওয়া সাওয়াবের সমান হবে, এরও তো কোনো দলিল নেই। তখন হতে পারে, তুমি কম সাওয়াব পাবে আর তোমার থেকে বেশি সাওয়াব নেওয়া হবে।

এগুলো সব শয়তানের ধোঁকা

এগুলো সবই শয়তানের ধোঁকা। যা সে মানুষকে ভুল পথে পরিচালনার জন্য মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এমন করলে হিসেব সমান হয়ে যাবে।

আরে ভাই, আখেরাতে একমাত্র সাওয়াবের মাধ্যমেই আদান-প্রদান করা হবে। যখন তোমার সাওয়াব অন্যকে দিয়ে দেওয়া হবে, তখন বুঝবে, কোন ধোঁকায় পড়েছিলে? দুনিয়াতে কষ্ট করে অনেক সাওয়াব কামাই করেছ, নামাজ পড়েছ, রোজা রেখেছ, তিলাওয়াত করেছ, রমজানের রাতে বিনিদ্র জেগেছ, ইতিকাফ করার তাওফিক হয়েছিল, রাতভর জেগে জেগে ইবাদত ও নফল নামাজ আদায় করেছ। যখন কিয়ামতের ময়দানে উঠে দেখবে যে, তোমার সেই আমলগুলো অন্যের মালিকানায় চলে যাচ্ছে। তোমার উপার্জনগুলো অন্যের আমলনামা সমৃদ্ধ হচ্ছে। ওই সময় কী পরিমাণ অনুতাপ, অনুশোচনা হবে? তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এমন অনুতাপ যে, এখন তার শূন্যতা পূরণ করার একটা পথও বাকি নেই। কাজেই শয়তান তোমাকে যেই ধোঁকা দিচ্ছে যে, পরকালে হিসাব সমান সমান হয়ে যাবে। এটি

আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

বুজুর্গদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা

'আরওয়াহে সালাসাহ কিতাবে হজরত থানভি রহ. একটি ঘটনা লিখেছেন। এক ব্যক্তি এক বুজুর্গের নিকট এসে বললেন, হজরত, বুজুর্গদের একেক জনের অবস্থা একেক রকম কেন? আমি দেখতে চাই কার কী অবস্থা?

বুজুর্গ ওই ব্যক্তিকে নিষেধ করে বললেন, আরে ভাই তুমি আবার কোন খপ্পরে পড়ে গেলে। কোন চক্করে পড়ে গেলে। সুতরাং বাদ দাও এর পেছনে পড়া থেকে।

কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা হয়ে বুজুর্গের পেছনে পড়ে রইল। তাকে উত্তর পেতেই হবে।
তখন তিনি বলে দিলেন, যাও ওই গ্রামে গিয়ে দেখবে মসজিদে তিনজন বুজুর্গ ইবাদত করছেন। তুমি গিয়ে তাদের প্রত্যেককে পেছন দিক থেকে একটি করে ঘুষি মেরে দেবে। এরপর তারা কি করে তা এসে আমার কাছে বয়ান করবে।

কথামতো তিনি ওই গ্রামে গিয়ে মসজিদে তিন বুজুর্গ ব্যক্তিকে ইবাদতে মশগুল পেলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের পেছন দিক থেকে তিনজনকে তিনটি ঘুষি মেরে দিলেন। ফিরে আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী ব্যাপার, কী ঘটনা?

ওই ব্যক্তি ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বলল, আমি যখন প্রথম বুজুর্গকে ঘুষি মারলাম তখন ওই বুজুর্গ একটুও পেছন ফিরে তাকালেন না; বরং নিজ জিকির-আজকারে মশগুল থাকলেন। দ্বিতীয় বুজুর্গকে যখন ঘুষি মারলাম তখন ওই বুজুর্গ ব্যক্তি এসে আমাকেও অনুরূপ ঘুষি মেরে দিলেন। যখন তৃতীয় বুজুর্গকে ঘুষি মারলাম তিনি এসে আমার হাত দাবানো শুরু করে দিলেন। আর বলতে লাগলেন, আচ্ছা আপনার হাতে ব্যথা লাগেনি তো!!

বুজুর্গ তখন বললেন, এখন দেখলে আল্লাহ তাআলা কীভাবে একেক বুজুর্গকে একেক রং দিয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের মিশ্রণে আল্লাহ তাদেরকে রাঙিয়ে তুলেছেন।

অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে পিছে পড়ে যাব

এরপর বুজুর্গ উক্ত তিন বুজুর্গের অবস্থা ব্যাখ্যা করে বললেন, প্রথম বুজুর্গের অবস্থা হলো, তিনি ভাবলেন, আমি জিকিরে মশগুল। এমতবস্থায় একজন এসে আমাকে পেছন থেকে ঘুষি মেরেছে তাতে কী হয়েছে? কেয়ামত তো

আর হয়নি। আমি যদি পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, কে মেরেছে? কেন মেরেছে? আর তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ফিকির করি, তাহলে আমি আমার পথ থেকে পেছনে পড়ে যাব। আমার লক্ষ্যপথ থেকে চ্যুত হব। আমার বর্তমানের মূল্যবান কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এজন্যে তিনি পেছনে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করেননি যে, কে মেরেছে? এটি হলো তার বুজুর্গির বিশেষ এক রং।

স্নেহপরবশ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ

এরপর বুজুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, যে বুজুর্গ পেছন দিকে ফিরে বদলা স্বরূপ ফিরিয়ে ঘুষি দিলেন, বলো দেখি, তুমি যতটুকু জোরে মেরেছিলে, তার সেই মুষি তার সমান কিনা? সে জবাব দিল হ্যাঁ, ওই পরিমাণ।

তখন তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন, এটা হলো বুজুর্গির দ্বিতীয় অবস্থা। কারণ বদলা নেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা ইজাযত দিয়েছেন। আর এ

বদলা নেওয়াটাও ওই আল্লাহওয়ালার পক্ষ হতে একটি স্নেহভরা সিদ্ধান্ত। কেননা দেখা গেছে বুজুর্গদেরকে কষ্ট দেওয়ার পর বুজুর্গ ব্যক্তি যখন সবর করে তখন এর কারণে কষ্টদাতা ব্যক্তিকে মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কেননা হাদিসে এসেছে,

مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে ব্যক্তি আমার ওলির সঙ্গে দুশমনি করে, আমার পক্ষ থেকে

ওই ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধের ঘোষণা রইল। ২

এ কারণেই ওই বুজুর্গ তোমার থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। এটি হলো বুজুর্গদের দ্বিতীয় রং।

তৃতীয় অবস্থা

তৃতীয় বুজুর্গের রং প্রথম দু'জনের চেয়ে ভিন্ন। তাঁর চেতনা হলো, আমাকে সে মেরেছে। এর কারণে আমি কিইবা ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু আমাকে যিনি মেরেছেন তিনি তো অনেক বেশি ব্যথা পেয়েছেন। এ কথা ভেবে তিনি প্রহারকারীর হাত মালিশ করে দিতে লাগলেন। এই হলো বুজুর্গদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা।

কাজেই আমি বলতে চাই, অন্যের কোনো কাজের ওপর কারও মনে রাগ আসাটা গুনাহ নয়; তবে এই রাগের কারণে বদলা নিতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হলে সেটি হবে অন্যায়। এজন্য সীমালঙ্ঘন হয়ে যেতে পারে তাই বদলা না নেওয়াই উত্তম; বরং মাফ করে দাও। এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান মিলবে এবং নিজেকেও ক্ষতি থেকে বাঁচানো যাবে।

গীবতের প্রকৃত ওষুধ বিনয়

হজরত থানভি রহ. এরপর বলেন,

'গীবতের অন্যতম চিকিৎসা হলো, বিনয়; কিন্তু এই বিনয় এক দিনেই সৃষ্টি হয় না। কাজেই যতদিন পর্যন্ত বিনয়ের গুণ অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত গীবত থেকে বাঁচার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হলো, চিন্তা-ভাবনা না করে কোনো কথা বলবে না। যে কথাই বলবে, যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেই বলবে। দেখবে, গীবতের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। আস্তে আস্তে পুরোপুরি চলে যাবে। যদি কখনো ভুলক্রমে কোনো কথা চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দুই রাকাত নফল নামাজ 'সলাতুত তাওবাহ'-এর নিয়তে আদায় করবে। ০৪

অর্থাৎ হজরত থানভি রহ, উক্ত বাণীর মাঝে এ কথা বলেছেন যে, আমার থেকে কখনই যেন গীবত প্রকাশ না পায়, এ জন্যে আমাকে যে পথ অবলম্বন করতে হবে, তাহলো, নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। সব সময় মনে রাখবে, গীবত জন্ম নেয় ব্যক্তির মাঝে বিনয় না থাকার কারণে। মানুষ যখন নিজেকে বড় মনে করবে, অহংকারের শিকার হবে তখন সে গীবত করবে। যে ব্যক্তির চোখ নিজের দোষের ওপর সে ব্যক্তি তো সব সময় তার সংশোধন নিয়েই ভাববে। অন্যের দোষের দিকে তার তাকানোর সময় কোথায়? তার তো সার্বক্ষণিক চিন্তা হলো, আমার মধ্যে এ দোষ রয়েছে। আমার মধ্যে ওই দোষ রয়েছে। আমাকে আমার দোষগুলো দূর করতে হবে। এমতবস্থায় তার তাবৎ মনোযোগ থাকবে নিজেকে নিয়ে।

অন্যের দোষ দেখবে, সে সময় কোথায়?

এর বিপরীতে যদি মনের মধ্যে অহংকার থাকে তখন সে নিজেকে বড় মনে করে, অন্যকে ছোট জ্ঞান করে। তার তো নিজেকে নিয়ে ভাবনা নেই; এ কারণে সে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় যে, যায়েদের মাঝে ওই দোষ আছে। বকরের মাঝে ওই ত্রুটি আছে। এরপর সে ওই দোষগুলো অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়। কাজেই গীবতের মূল উৎস হলো, আত্মমুগ্ধতা ও অহংকার। যদি সেই আত্মমুগ্ধতা ও অহংকার নির্মূল হয়ে যায় তাহলে আর তার থেকে গীবত প্রকাশ পাবে না। কাজেই গীবত নির্মূল করার প্রকৃত চিকিৎসা হলো, নিজের ভেতরের অহংকার দূর করে তদস্থলে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে।

গীবত থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়

গীবত থেকে বাঁচার জন্যে হজরত থানভি রহ. এক বিস্ময়কর আমল বয়ান করেছেন। যদিও এটা কষ্টদায়ক তবে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিলে অল্প সময়ে তা ফলদায়ক। তিনি লিখেছেন,

গীবতের একটি বিস্ময়কর কার্যকর চিকিৎসা হলো, যার গীবত করেছ, তার কাছে হাজির হয়ে নিজের এই কৃতকর্মের কথা জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ, কিছু দিন এর ওপর নিয়মিত আমল করা হলে এই রোগ পুরোপুরি সেরে যাবে।"

যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট গিয়ে বলে দাও, ভাই, তোমার ব্যাপারে এমন গীবত করেছি। যখন এটা বলতে যাবে তখন দিলের মাঝে অবশ্যই হতাশা এসে যাবে। হায়, আমি তার গীবত করলাম। এই হতাশা দিলের মধ্যে অপারেশনের মতো কাজ করবে।

দ্বিতীয় কথা হলো, যখন এভাবে গিয়ে তার নিকট বলবে, এর দ্বারা ওই ব্যক্তির দিলও নরম হয়ে যাবে। ভাবতে থাকবে, হায়, এ ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে আমার নিকট এসেছে। কাজেই আমি তাকে মাফ করে দিই।

অতএব, গীবতের ফলে যে দুশমনি বা ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতো, তা আর হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ